আগুন জ্বলে

আবোল তাবোল

সুকুমার রায়

সিগনেট প্রেস · কলিকাতা২০

দ্বিতীয় সিগ্নেট সংস্করণ ১৩৫৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগ্নেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড কলিকাতা
সুকুমার রায়ের
মূল ছবি বাদে
অন্যান্য ছবি এঁকেছেন
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
শিবরাম দাস
মুদ্রাকর
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্নওআলিস স্ট্রিট
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট

*

দাম দু টাকা বারো আনা

কৈফিয়ৎ

যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে-রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ-পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।

গ্রন্থকার

আজ বহুদিন পর সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' আবার প্রকাশিত হচ্ছে। মূল-সংস্করণে যা কিছু ছিলো সবই এই নব-সংস্করণে বর্তমান— অদল-বদল শুধু সজ্জা-বিন্যাসে। নতুন ছবি যা-কিছু সংযোগ করা হয়েছে সেগুলি সুকুমারবাবুর সুযোগ্য পুত্র সত্যজিৎ রায়ের আঁকা। যাঁদের সহৃদয় সহযোগিতায় এই নব-সংস্করণ 'আবোল তাবোল' প্রকাশ সম্ভব হলো, পরিচয়-পত্রে তাঁদের পরিচয় মিলবে। তা ছাড়া বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বেঙ্গল পেপার মিলসের শ্রীযুক্ত প্রতাপ কুমার সিংহের নাম। এই দুর্দিনে তাঁর সহযোগিতা ভিন্ন এই সংস্করণ অসম্ভব হতো—এ-কথা যে অত্যুক্তি নয় ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

সূচীপত্র



আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব-হীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে॥

খিচুড়ি



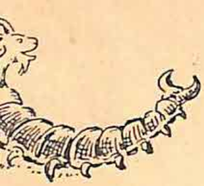




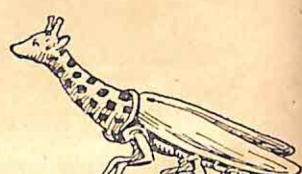
হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"বাহবা কি ফুর্তি !
অতি খাসা আমাদের 'বকচ্ছপ মূর্তি'।"



টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা—
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা ?



ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি !



জিরাফের সাধ নাই মাঠ ঘাটে ঘুরিতে,
ফড়িঙের ঢং ধরি সেও চায় উড়িতে।





গরু বলে, "আমারেও ধরিল কি ও রোগে ?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে ?"
'হাতিমি'র দশা দেখে—তিমি ভাবে জলে যাই,
হাতি বলে, "এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।"
সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট—
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট।





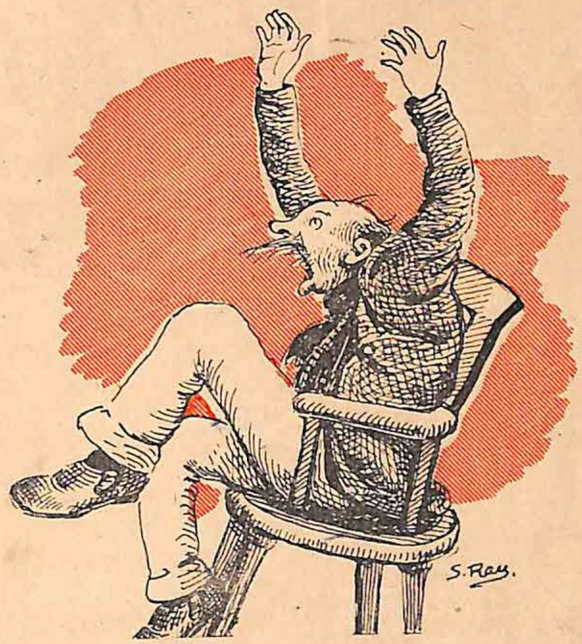
হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে-যেন কে বৃদ্ধ
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে গুণ্ গুণ্ সঙ্গীত
ভাব দেখে মনে হয় না-জানি কি পণ্ডিত!
বিড়্ বিড়্ কি যে বকে নাহি তার অর্থ—
"আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত।"
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম,
রেগে বলে, "কেবা বোঝে এ সবের মর্ম?
আরে মোলো, গাধাগুলো একেবারে অন্ধ,
বোঝেনাকো কোনো কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব।
কোন্ কাঠে কত রস জানে নাকো তত্ত্ব,
একাদশী রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত?"

আশে পাশে হিজি বিজি আঁকে কত অঙ্ক
ফাটা কাঠ ফুটো কাঠ হিসাব অসংখ্য;
কোন্ ফুটো খেতে ভাল, কোন্‌টা বা মন্দ,
কোন্ কোন্ ফাটলের কি রকম গন্ধ।
কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক্ শব্দ,
বলে, "জানি কোন্ কাঠ কিসে হয় জব্দ;
কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি পষ্ট,
এ কাঠের বজ্জাতি কিসে হয় নষ্ট।
কোন্ কাঠ পোষ মানে, কোন্ কাঠ শান্ত,
কোন্ কাঠ টিম্‌টিমে, কোন্‌টা বা জ্যান্ত।
কোন্ কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কি সত্য,
আমি জানি কোন্ কাঠে কেন থাকে গর্ত।"



হেড অফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানত ?
দিব্যি ছিলেন খোসমেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা বসে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে !
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি ক'রে গোল,
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল !"
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে, "কামড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস।"
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি,
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি !"
গোঁফ হারানো ! আজব কথা ! তাও কি হয় সত্যি ?
গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সামনে ধরে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয় না।

গোঁফচুরি



রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
"এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই"—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
"আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর,
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
"ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি,
"মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা ?
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

সৎপাত্র

শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে—
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে ?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে ?
জানতে চাও সে কেমন ছেলে ?—
মন্দ নয়, সে পাত্র ভালো—
রঙ যদিও বেজায় কালো ;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক পেঁচার মতন।
বিদ্যে বুদ্ধি ? বলছি মশাই—
ধন্যি ছেলের অধ্যবসায় !
উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে।
ঘায়েল হয়ে থামল শেষে।
বিষয় আশয় ? গরীব বেজায়—
কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে যায়।







মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার—
একটা পাগল একটা গোঁয়ার ;
আরেকটি সে তৈরি ছেলে,
জাল করে নোট গেছেন জেলে।
কনিষ্ঠটি তবলা বাজায়
যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।
গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে
পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে।
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর,
কংসরাজের বংশধর !
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের।—
যাহোক, এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দ ছেলে ?



সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যে-রকম রুচি—
মণ্ডা মিঠাই চপ্ কাট্‌লেট্ খাজা কিংবা লুচি।
মন বলে তায় 'খাব খাব', মুখ চলে তায় খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে।
এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁস্ রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।
হেসে খেলে দু-দশ যোজন চলবে বিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হয়ে জিভের জলে ভেসে।
সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো,
অতুল কীর্তি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।



লড়াই ক্ষ্যাপা

ওই আমাদের পাগলা জগাই, নিত্যি হেথায় আসে ;
আপন মনে গুনগুনিয়ে মুচকি-হাসি হাসে।
চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন থমক লেগে থামে,
তড়াক করে লাফ দিয়ে যায় ডাইনে থেকে বামে।
ভীষণ রোখে হাত গুটিয়ে সামলে নিয়ে কোঁচা ;
'এইয়ো' বলে ক্ষ্যাপার মতো শূন্যে মারে খোঁচা।
চেঁচিয়ে বলে, "ফাঁদ পেতেছ ? জগাই কি তায় পড়ে?
সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে।"
উৎসাহেতে গরম হয়ে তিড়িংবিড়িং নাচে,
কখনও যায় সামনে তেড়ে, কখনও যায় পাছে।

এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি ধুপুস্‌ধাপুস্ কতো !
চক্ষু বুজে কায়দা খেলায় চর্কিবাজির মতো।
লাফের চোটে হাঁফিয়ে ওঠে গায়েতে ঘাম ঝরে,
দুড়ুম করে মাটির পরে লম্বা হয়ে পড়ে।
হাত পা ছুড়ে চেঁচায় খালি চোখটি করে ঘোলা,
"জগাই মোলো হঠাৎ খেয়ে কামানের এক গোলা !"
এই না বলে মিনিট খানেক ছট্‌ফটিয়ে খুব,
মড়ার মতো শক্ত হয়ে একেবারে চুপ !
তার পরেতে সটান বসে চুলকে খানিক মাথা,
পকেট থেকে বার করে তার হিসেব লেখার খাতা।
লিখল তাতে—"শোনরে জগাই, ভীষণ লড়াই হলো,
পাঁচ ব্যাটাকে খতম করে জগাইদাদা মোলো।"





সাবধান!

আরে আরে, ওকি কর প্যালারাম বিশ্বাস ?
ফোঁস্ ফোঁস্ অত জোরে ফেলোনাকো নিশ্বাস !
জানোনা কি সে-বছর ও-পাড়ার ভূতোনাথ,
নিশ্বাস নিতে গিয়ে হয়েছিল কুপোকাত ?
হাঁপ ছাড় হ্যাঁসফ্যাঁস ও-রকম হাঁ করে—
মুখে যদি ঢুকে বসে পোকা মাছি মাকড়ে ?
বিপিনের খুড়ো হয় বুড়ো সেই হল রায়,
মাছি খেয়ে পাঁচমাস ভুগেছিল কলেরায়।
তাই বলি—সাবধান ! করোনাকো ধুপ্‌ধাপ্,
টিপি টিপি পায় পায় চলে যাও চুপ্‌চাপ্
চেয়োনাকো আগে পিছে, যেয়োনাকো ডাইনে
সাবধানে বাঁচে লোকে—এই লেখে আইনে।
পড়েছ তো কথামালা ? কে যেন সে কি করে
পথে যেতে পড়ে গেল পাতকোর ভিতরে ?
ভালো কথা—আর যেন সকালে কি দুপুরে,
নেয়োনাকো কোনোদিন ঘোষেদের পুকুরে ;
এ-রকম মোটা দেহে কি যে হবে কোন দিন,
কথাটাকে ভেবে দেখ কি-রকম সঙিন।
চটো কেন ? হয় নয় কেবা জানে পষ্ট,
যদি কিছু হয়ে পড়ে পাবে শেষে কষ্ট।
মিছিমিছি ঘ্যান্‌ঘ্যান্ কেন কর তক্ক ?
শিখেছ জ্যাঠামো খালি, ইঁচড়েতে পক্ক ;
মানবে না কোনো কথা চলা ফেলা আহারে,
একদিন টের পাবে ঠেলা কয় কাহারে।
রমেশের মেঝমামা সেও ছিল শেয়না,
যত বলি ভালো কথা কানে কিছু নেয় না ;
শেষকালে একদিন চান্নির বাজারে
পড়ে গেল গাড়ি চাপা রাস্তার মাঝারে !

ছায়া

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা।
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জাননা বুঝি ?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি !
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুরবেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখছি কত ঘেঁটে—
হাল্কা মেঘের পানসে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।
কেউ জানে না এ-সব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মতো ছায়ার পিছুপিছু।
তোমরা ভাব গাছের ছায়া অমনি লুটায় ভূঁয়ে,
অমনি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে ;
আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোনো,
বলছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার রয়না কাছে, দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছটফটিয়ে এদিক ওদিক চায়।
সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্ করে ধরবে তারে ঠেসে।
পাতলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।

বাজী



গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপ্‌রে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাকবে তাহার নাক।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।
আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে যদি খায়,
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে বাঁচতে যদি চাও,
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে,
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে!
পাক্কা নতুন টাট্‌কা ওষুধ এক্কেবারে দিশি—
দাম করেছি সস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।

কুমড়োপটাশ

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ নাচে—
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে ;
চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে ;
চার পা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমূলার গাছে।



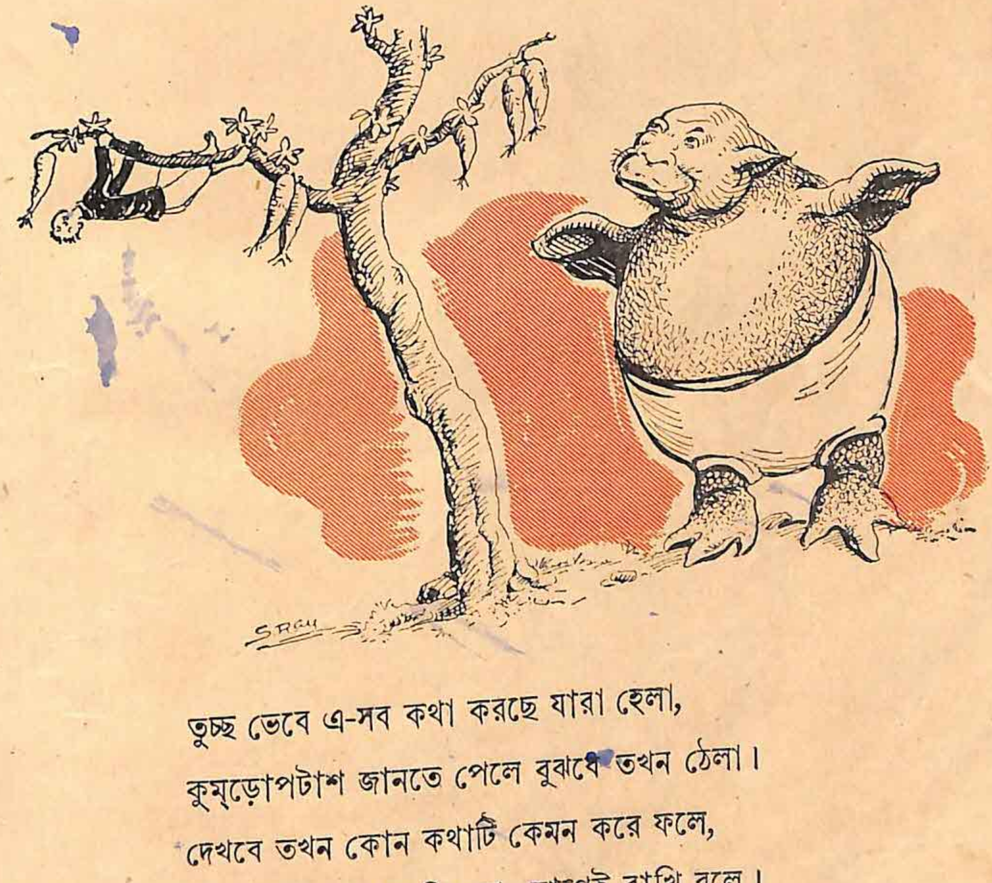
(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ কাঁদে—
খবরদার ! খবরদার ! বসবে না কেউ ছাদে ;
উপুড় হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে,
বেহাগ সুরে গাইবে খালি 'রাধে কৃষ্ণ রাধে' !



(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ হাসে—
থাকবে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্নাঘরের পাশে ;
ঝাপ্‌সা গলায় ফার্সি কবে নিশ্বাসে ফিস্‌ফাসে ;
তিনটি বেলা উপোস করে থাকবে শুয়ে ঘাসে !

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ ছোটে—
সবাই যেন তড়বড়িয়ে জানলা বেয়ে ওঠে ;
হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে ;
ভুলেও যেন আকাশ পানে তাকায় না কেউ মোটে !

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ ডাকে—
সবাই যেন শামলা এঁটে গামলা চড়ে থাকে ;
ছেঁচকি শাকের ঘণ্ট বেটে মাথায় মলম মাখে ;
শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষতে থাকে নাকে।



তুচ্ছ ভেবে এ-সব কথা করছে যারা হেলা,
কুম্‌ড়োপটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।
দেখবে তখন কোন কথাটি কেমন করে ফলে,
আমায় তখন দোষ দিও না, আগেই রাখি বলে।

প্যাঁচা আর প্যাঁচানী

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী,
খাসা তোর চ্যাঁচানি
শুনে শুনে আন্‌মন
নাচে মোর প্রাণমন !
মাজা-গলা চাঁচা সুর
আহ্লাদে ভরপুর !
গলা-চেরা ধমকে
গাছ পালা চমকে,
সুরে সুরে কত প্যাঁচ
গিট্‌কিরি ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ !
যত ভয় যত দুখ
দুরু দুরু ধুক্ ধুক্,
তোর গানে পেঁচি রে
সব ভুলে গেছিরে,
চাঁদামুখে মিঠে গান
শুনে ঝরে দু'নয়ান।



আর যেখানে যাও না রে ভাই সপ্তসাগর পার,
কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার!
সর্বনেশে বৃদ্ধ সে ভাই যেও না তার বাড়ী—
কাতুকুতুর কুল্‌পি খেয়ে ছিঁড়বে পেটের নাড়ী।
কোথায় বাড়ী কেউ জানে না, কোন্ সড়কের মোড়ে,
একলা পেলে জোর ক'রে ভাই গল্প শোনায় প'ড়ে।
বিদ্‌ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন্ দেশী,
শুনলে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশী।
না আছে তার মুণ্ডু মাথা, না আছে তার মানে,
তবুও তোমায় হাসতে হবে তাকিয়ে বুড়োর পানে।
কেবল যদি গল্প বলে তাও থাকা যায় সয়ে,
গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেয় লম্বা পালক লয়ে।
কেবল বলে, "হোঃ হোঃ হোঃ, কেষ্টদাসের পিশি—
বেচ্‌ত খালি কুমড়ো কচু হাঁসের ডিম আর তিসি।
ডিমগুলো সব লম্বা মতন, কুমড়োগুলো বাঁকা,
কচুর গায়ে রঙ-বেরঙের আল্‌পনা সব আঁকা।
অষ্ট প্রহর গাইত পিশি আওয়াজ ক'রে মিহি,
ম্যাও ম্যাও ম্যাও বাকুম্ বাকুম্ ভৌ ভৌ চীঁহি।"
এই না বলে কুটুৎ ক'রে চিম্‌টি কাটে ঘাড়ে,
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।
তোমায় দিয়ে সুড়সুড়ি সে আপনি লুটোপুটি,
যতক্ষণ না হাসবে তোমার কিচ্ছুতে নাই ছুটি!



কাতুকুতু বুড়ো

বুড়ীর বাড়ী



গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি,
ঝুর্‌ঝুরে প'ড়ো ঘরে থুর্‌থুরে বুড়ী।
কাঁথাভরা ঝুল্‌কালি, মাথাভরা ধুলো,
মিট্‌মিটে ঘোলা চোখ, পিটখানা কুলো।
কাঁটা দিয়ে আঁটা ঘর—আঠা দিয়ে সেঁটে,
সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে থুতু দিয়ে চেটে।
ভর দিতে ভয় হয় ঘর বুঝি পড়ে,
খক্ খক্ কাশি দিলে ঠক্ ঠক্ নড়ে।
ডাকে যদি ফিরিওয়ালা, হাঁকে যদি গাড়ী,
খসে পড়ে কড়িকাঠ ধসে পড়ে বাড়ী।
বাঁকাচোরা ঘরদোর ফাঁকা ফাঁকা কত,
ঝাঁট দিলে ঝ'রে পড়ে কাঠকুটো যত।
ছাঁদগুলো ঝুলে পড়ে বাদ্‌লায় ভিজে,
একা বুড়ী কাঠি গুঁজে ঠেকা দেয় নিজে।
মেরামত দিনরাত কেরামত ভারি,
থুর্‌থুরে বুড়ী তার ঝুর্‌ঝুরে বাড়ী॥

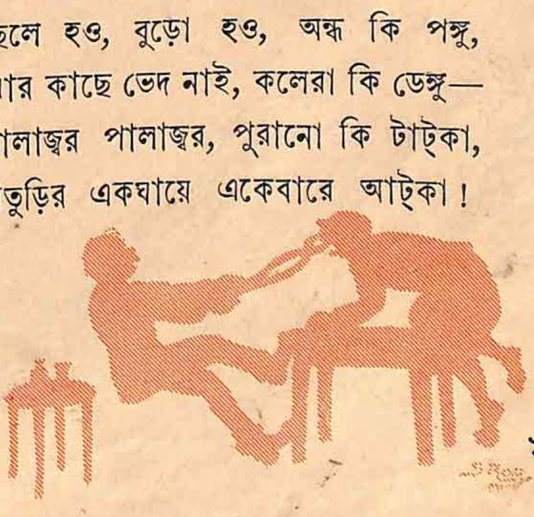
কহ ভাই কহ রে, অ্যাঁকা চোরা শহরে,
বদ্যিরা কেন কেউ আলুভাতে খায় না?
লেখা আছে কাগজে আলু খেলে মগজে,
ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না!

শুনেছ কি ব'লে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টক্‌টক্ গন্ধ?
টক্‌টক্ থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবার মিষ্টি।

হাতুড়ে



একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামৎ—
কাটা ছেঁড়া ভাঙা চেরা চট্‌পট্‌ মেরামৎ।
কয়েছেন গুরু মোর, "শোন শোন বৎস,
কাগজের রোগী কেটে আগে কর মক্‌স।"
উৎসাহে কি না হয় ? কি না হয় চেষ্টায় ?
অভ্যাসে চট্‌পট্‌ হাত পাকে শেষটায়।
খেটে খুটে জল হ'ল শরীরের রক্ত,—
শিখে দেখি বিদ্যেটা নয় কিছু শক্ত।
কাটা ছেঁড়া ঠুক্‌ ঠাক্‌, কত দেখ যন্ত্র,
ভেঙে চুরে জুড়ে দেই তারও জানি মন্ত্র।
চোখ বুঁজে চট্‌পট্‌ বড় বড় মূর্তি,—
যত কাটি ঘ্যাস্‌ ঘ্যাস্‌ তত বাড়ে ফুর্তি।
ঠ্যাং-কাটা গলা-কাটা কত কাটা হস্ত,
শিরিষের আঠা দিয়ে জুড়ে দেই চোস্ত।
এইবারে বলি তাই, রোগী চাই জ্যান্ত—
ওরে ভোলা, গোটাছয় রোগী ধরে আন্‌ত!
গেঁটেবাতে ভুগে মরে ও পাড়ার নন্দী,
কিছুতেই সারাবে না এই তার ফন্দি—
একদিন এনে তারে এইখানে ভুলিয়ে,
গেঁটেবাত ঘেঁটে-ঘুঁটে সব দেব ঘুলিয়ে।
কার কানে কট্‌কট্‌ কার নাকে সর্দি,
এস, এস, ভয় কিসে ? আমি আছি বদ্যি।
শুয়ে কেরে ? ঠ্যাং-ভাঙা ? ধ'রে আন এখেনে,
স্ক্রুপ্‌ দিয়ে এঁটে দেব কি রকম দেখেনে।
গালফোলা কাঁদো কেন ? দাঁতে বুঝি বেদনা ?
এসো এসো ঠুকে দেই—আর মিছে কেঁদো না ;
এই পাশে গোটা দুই, ওই পাশে তিনটে—
দাঁতগুলো টেনে দেখি—কোথা গেল চিম্‌টে ?
ছেলে হও, বুড়ো হও, অন্ধ কি পঙ্গু,
মোর কাছে ভেদ নাই, কলেরা কি ডেঙ্গু—
কালাজ্বর পালাজ্বর, পুরানো কি টাট্‌কা,
হাতুড়ির একঘায়ে একেবারে আট্‌কা!



ভাল রে ভাল!

দাদা গো ! দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর—
এই দুনিয়ার সকল ভাল,
আসল ভাল নকল ভাল,
সস্তা ভাল দামীও ভাল,
তুমিও ভাল আমিও ভাল,
হেথায় গানের ছন্দ ভাল,
হেথায় ফুলের গন্ধ ভাল,
মেঘ-মাখান আকাশ ভাল,
ঢেউ-জাগান বাতাস ভাল,
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল,
ময়লা ভাল ফর্‌সা ভাল,
পোলাও ভাল কোর্মা ভাল,
মাছপটোলের দোল্‌মা ভাল,
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল,
সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল,
কাঁসিও ভাল ঢাকও ভাল,
টিকিও ভাল টাকও ভাল,
ঠেলার গাড়ী ঠেল্‌তে ভাল,
খাস্তা লুচি বেল্‌তে ভাল,
গিট্‌কিরি গান শুন্‌তে ভাল,
শিমুল তুলো ধুন্‌তে ভাল,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল,
কিন্তু সবার চাইতে ভাল—
—পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড় ।

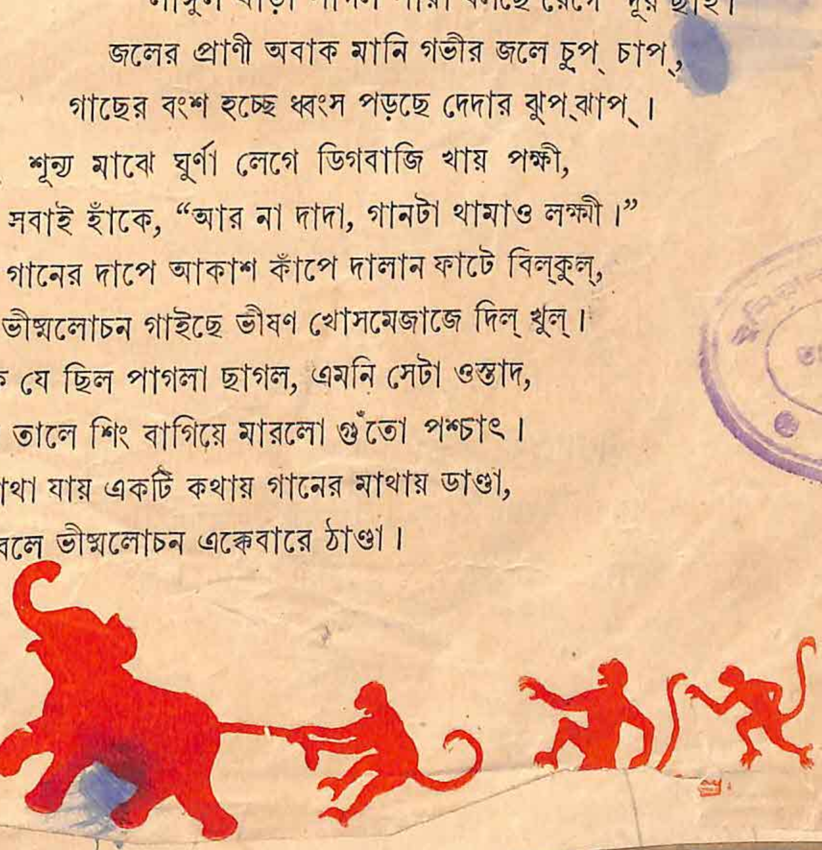
অবাক কাণ্ড!

শুন্‌ছ দাদা ! ঐ যে হোথায় বদ্যি বুড়ো থাকে,
সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে ?
শুন্‌ছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে ?
চক্ষু নাকি আপনি বোঁজে ঘুমটি তেমন পেলে ?
চল্‌তে গেলে ঠ্যাং নাকি তার ভুঁয়ের পরে ঠেকে ?
কান দিয়ে সব শোনে নাকি ? চোখ দিয়ে সব দেখে ?
শোয় নাকি সে মুণ্ডুটাকে শিয়র পানে দিয়ে ?
হয় কি না হয় সত্যি মিথ্যা চল্‌ না দেখি গিয়ে ?

গানের গুঁতো



গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা—
আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা !
গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া, গাইছে তেড়ে প্রাণপ্রণ,
ছুটছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্ ভন্ ।
মরছে কত জখম হয়ে করছে কত ছট্ ফট্—
বলছে হেঁকে, "প্রাণটা গেল, গানটা থামাও ঝট্ পট্ ।"
বাঁধন-ছেঁড়া মহিষ ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত ;
ভীষ্মলোচন গাইছে তেড়ে নাইকো তাহে দৃক্‌পাত ।
চার পা তুলি জন্তুগুলি পড়ছে বেগে মূর্ছায়,
লাঙ্গুল খাড়া পাগল পারা বলছে রেগে "দূর ছাই ।"
জলের প্রাণী অবাক মানি গভীর জলে চুপ্ চাপ্,
গাছের বংশ হচ্ছে ধ্বংস পড়ছে দেদার ঝুপ্‌ঝাপ্ ।
শূন্য মাঝে ঘূর্ণা লেগে ডিগবাজি খায় পক্ষী,
সবাই হাঁকে, "আর না দাদা, গানটা থামাও লক্ষ্মী ।"
গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফাটে বিল্‌কুল্,
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোসমেজাজে দিল্ খুল্ ।
এক যে ছিল পাগলা ছাগল, এমনি সেটা ওস্তাদ,
গানের তালে শিং বাগিয়ে মারলো গুঁতো পশ্চাৎ ।
আর কোথা যায় একটি কথায় গানের মাথায় ডাণ্ডা,
'বাপ্‌রে' বলে ভীষ্মলোচন এক্কেবারে ঠাণ্ডা ।



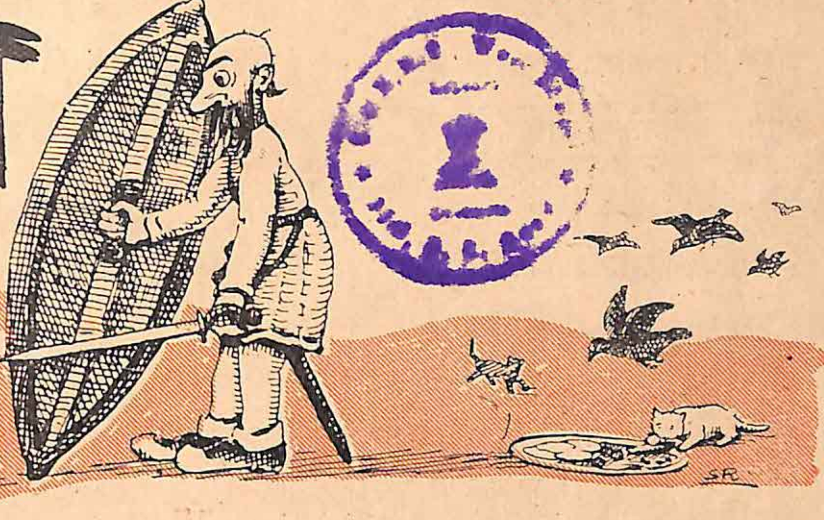
বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত,
সারাদিন ধ'রে তার শুনি শুধু খুঁতখুঁত।
মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মরে খালি সে,
ঘ্যান্ ঘ্যান্ আব্‌দারে ঘন ঘন নালিশে।
এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না—
কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না।
কোকিলের মতো তার কণ্ঠেতে সুর চাই,
গলা শুনে আপনার বলে, 'উঁহুঁ, দূর ছাই!'
আকাশেতে উড়ে যেতে পাখিদের মানা নেই,
তাই দেখে মরে কেঁদে—তার কেন ডানা নেই।
হাতিটার কী বাহার দাঁতে আর শুণ্ডে—
ও রকম জুড়ে তার দিতে হবে মুণ্ডে!
ক্যাঙ্গারুর লাফ দেখে ভারি তার হিংসে—
ঠ্যাং চাই আজ থেকে ঢ্যাংঢেঙে চিম্‌সে!
সিংহের কেশরের মতো তার তেজ কই?
পিছে খাসা গোসাপের খাঁজকাটা লেজ কই?
একলা সে সব হ'লে মেটে তার প্যাখ্‌না;
যারে পায় তারে বলে, 'মোর দশা দেখ্‌না!'

কেঁদে কেঁদে শেষটায়—আষাঢ়ের বাইশে
হ'ল বিনা চেষ্টায় চেয়েছে যা তাই সে।
ভুলে গিয়ে কাঁদাকাটি আহ্লাদে আবেশে
চুপিচুপি একলাটি ব'সে ব'সে ভাবে সে—
লাফ দিয়ে হুশ্ করে হাতি কভু নাচে কি?
কলাগাছ খেলে পরে ক্যাঙ্গারুটা বাঁচে কি?
ভোঁতামুখে কুহুডাক শুনে লোকে কবে কি?
এই দেহে শুঁড়ো নাক খাপছাড়া হবে কি?
'বুড়ো হাতী ওড়ে ব'লে কেউ যদি গালি দেয়?
কান টেনে ল্যাজ্ ম'লে 'দুয়ো' ব'লে তালি দেয়?
কেউ যদি তেড়েমেড়ে বলে তার সামনেই—
'কোথাকার তুই কেরে, নাম নেই ধাম নেই?'
জবাব কি দেবে ছাই, আছে কিছু বল্‌বার?
কাঁচুমাচু ব'সে তাই, মনে শুধু তোল্‌পাড়—
'নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ বিচ্ছু,
মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু।
মাছ ব্যাং গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,
নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই!'

কিম্ভূত!

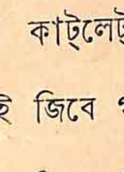


চোর ধরা

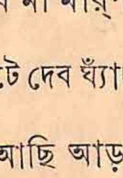


আরে ছি ছি! রাম রাম! ব'লো নাহে ব'লো না,
চল্‌ছে যা জুয়াচুরি, নাহি তার তুলনা।
যেই আমি দেই ঘুম টিফিনের আগেতে,
ভয়ানক ক'মে যায় খাবারের ভাগেতে।
রোজ দেখি খেয়ে গেছে, জানিনাকো কারা সে,
কালকে যা হ'য়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে!
পাঁচখানা কাট্‌লেট্‌, লুচি তিন গণ্ডা,
গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মণ্ডা,
আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙ্‌নি—
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতাখানা শূন্যি!

তাই আজ ক্ষেপে গেছি— কত আর পার্‌ব?
এতদিন স'য়ে স'য়ে এইবারে মার্‌ব।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁশিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা।
রামু হও, দামু হও, ওপাড়ার ঘোষ বোস্‌—
যেই হও এইবারে থেমে যাবে ফোঁস্‌ফোঁস্‌।
খাট্‌বে না জারিজুরি আঁটবে না মার্‌প্যাঁচ্‌
যারে পাব ঘাড়ে ধ'রে কেটে দেব ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ।
এই দেখ ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়ালে,
এইবারে টের পাবে মুণ্ডুটা বাড়ালে।



রোজ বলি 'সাবধান!' কানে তবু যায় না?
ঠেলাখানা বুঝ্‌বি তো এইবারে আয় না!



খুড়োর কল



কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো—
সবাই শুনে সাবাস্ বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।
খুড়োর যখন অল্প বয়স—বছর খানেক হবে—
উঠ্‌ল কেঁপে 'গুংগা' বলে ভীষণ অট্টরবে।
আর তো সবাই 'মামা' 'গাগা' আবোল তাবোল বকে;
খুড়োর মুখে 'গুংগা' শুনে চম্‌কে গেল লোকে।
বল্‌লে সবাই, "এই ছেলেটা বাঁচলে পরে তবে,
বুদ্ধি জোরে এ সংসারে একটা কিছু হবে।"
সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে,
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘণ্টায় চলে।
দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘণ্টা পাঁচেক ঘাঁটলে পরে আপনি যাবে বোঝা।
বলব কি আর কলের ফিকির, বলতে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে একেবারে খাসা।

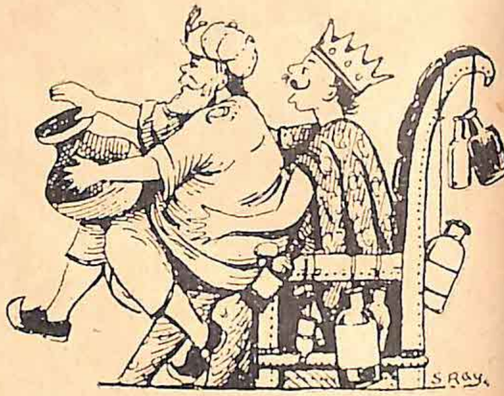


বাবুরাম সাপুড়ে

বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস্ বাপুরে ?
আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা!
যে সাপের চোখ্ নেই, শিং নেই নোখ্ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস্‌ফাঁস্, মারে নাকো ঢুঁশ্‌ঢাঁশ,
নেই কোনো উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত,
সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আন্‌ত।
তেড়ে মেরে ডাণ্ডা ক'রে দিই ঠাণ্ডা।



বোম্বাগড়ের রাজা



কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত ভাজা ?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা ?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা ?



কেন সেথায় সর্দি হ'লে ডিগ্‌বাজি খায় লোকে ?
জোছ্‌না রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে ?
ওস্তাদেরা লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে ?
টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে ?
রাত্রে কেন ট্যাক্‌ঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে ?
কেন রাজার বিছ্‌না পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে ?

সভায় কেন চেঁচায় রাজা 'হুক্কা হুয়া' ব'লে ?
মন্ত্রী কেন কল্‌সী বাজায় ব'সে রাজার কোলে ?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি ?
কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিশি ?
রাজার খুড়ো নাচেন কেন হুকোর মালা প'রে ?
এমন কেন ঘটছে তা কেউ বলতে পার মোরে ?



শব্দকল্পদ্রুম!

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্‌কা
ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পট্‌কা !
শাঁই শাঁই পন্‌পন্, ভয়ে কান্ বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ ?
হুড়মুড় ধুপ্‌ধাপ্—ওকি শুনি ভাই রে !
দেখ্‌ছ না হিম পড়ে—যেওনাকো বাইরে।
চুপ্ চুপ্ ঐ শোন্! ঝুপ্ ঝাপ্ ঝপা—স্!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ?—গব্ গব্ গবা—স্!
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, রাত কাটে ঐরে !
দুড়্ দাড়্ চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে !
ঘর্‌ঘর্ ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা !
কত মন নাচে শোন্—ধেই ধেই ধিন্‌তা !
ঠুং ঠাং ঢং ঢং, কত ব্যথা বাজে রে—
ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে !
হৈ হৈ মার্ মার্ 'বাপ্ বাপ্' চীৎকার—
মাল কোঁচা মারে বুঝি ? সরে পড়্ এইবার।

নেড়া বেলতলায় যায় কবার ?

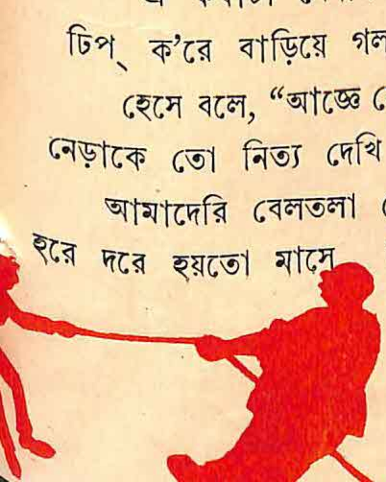


রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা   তার উপরে বসল রাজা—
ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা   খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।
গায়ে আঁটা গরম জামা   পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা;
রাজা বলে, "বৃষ্টি নামা— নইলে কিচ্ছু মিলছে না।"
থাকে সারা দুপুর ধ'রে   ব'সে ব'সে চুপটি ক'রে,
হাঁড়িপানা মুখটি ক'রে   আঁকড়ে ধ'রে শ্লেটটুকু;
ঘেমে ঘেমে উঠছে ভিজে ভ্যাবাচ্যাকা একলা নিজে,
হিজিবিজি লিখছে কি যে বুঝছে না কেউ একটুকু।
ঝাঁঝা রোদ আকাশ জুড়ে,   মাথাটার ঝাঁঝ্‌রা ফুঁড়ে,
মগজেতে নাচছে ঘুরে   রক্তগুলো ঝনর্ ঝন্;
ঠাঠা'-পড়া দুপুর দিনে, রাজা বলে, "আর বাঁচিনে,
ছুটে আন্ বরফ কিনে— ক'চ্ছে কেমন গা ছন্‌ছন্।"
সবে বলে, "হায় কি হল! রাজা বুঝি ভেবেই মোলো!
ওগো রাজা মুখটি খোল— কওনা ইহার কারণ কি ?
রাঙামুখ পান্‌সে যেন   তেলে ভাজা আম্‌সি হেন,
রাজা এত ঘামছে কেন— শুনতে মোদের বারণ কি ?"





রাজা বলে, "কেইবা শোনে যে কথাটা ঘুরছে মনে,
মগজের নানান্ কোণে— আনছি টেনে বাইরে তায়,
সে কথাটা বলছি শোন, যতই ভাব যতই গোণ,
নাহি তার জবাব কোনো কূলকিনারা নাইরে হায়!
লেখা আছে পুঁথির পাতে, 'নেড়া যায় বেলতলাতে,'
নাহি কোনো সন্ধ' তাতে— কিন্তু প্রশ্ন 'কবার যায়?'
এ কথাটা এদ্দিনেও পারেনিকো বুঝতে কেও,
লেখেনিকো পুস্তকেও, দিচ্ছে না কেউ জবাব তায়।
লাখোবার যায় যদি সে যাওয়া তার ঠেকায় কিসে?
ভেবে তাই পাইনে দিশে নাই কি কিচ্ছু উপায় তার?"
এ কথাটা যেমনি বলা রোগা এক ভিস্তিও'লা
ঢিপ্ ক'রে বাড়িয়ে গলা প্রণাম করল দু'পায় তাঁর।
হেসে বলে, "আজ্ঞে সে কি? এতে আর গোল হবে কি?
নেড়াকে তো নিত্য দেখি আপন চোখে পরিষ্কার—
আমাদেরি বেলতলা সে নেড়া সেথা খেলতে আসে
হরে দরে হয়তো মাসে নিদেন পক্ষে পঁচিশ বার।"



বুঝিয়ে

ও শ্যামাদাস! আয়তো দেখি, বোস্ তো দেখি এখেনে,
সেই কথাটা বুঝিয়ে দেব পাঁচ মিনিটে, দেখেনে।
জ্বর হয়েছে? মিথ্যে কথা! ওসব তোদের চালাকি—
এই যে বাবা চেঁচাচ্ছিলে, শুনতে পাইনি? কালা কি?
মামার ব্যামো? বদ্যি ডাকবি? ডাকিস না হয় বিকেলে;
না হয় আমি বাৎলে দেব বাঁচবে মামা কি খেলে!
আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাব,—
না বুঝবি তো মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাব।
কোন্ কথাটা? তাও ভুলেছিস্? ছেড়ে দিছিস্ হাওয়াতে?
কি বলছিলেম পরশু রাতে বিষ্টু বোসের দাওয়াতে?
ভুলিসনিতো বেশ করেছিস্, আবার শুনলে ক্ষেতি কি?
বড় যে তুই পালিয়ে বেড়াস্, মাড়াস্‌নে যে এদিক্ই!
বলছি দাঁড়া, ব্যস্ত কেন? বোস্ তা'হলে নিচুতেই—
আজ কালের এই ছোক্‌রাগুলোর তর্ সয়না কিছুতেই।
আবার দেখ! বসলি কেন? বইগুলো আন্ নামিয়ে—
তুই থাক্‌তে মুটের বোঝা বইতে যাব আমি এ?
সাবধানে আন্, ধরছি দাঁড়া—সেই আমাকেই ঘামালি,
এই খেয়েছে! কোন্ আক্কেলে শব্দকোষটা নামালি?
ঢের হয়েছে! আয় দেখি তুই বোস্ তো দেখি এদিকে—
ওরে গোপাল গোটাকয়েক পান দিতে বল্ খেঁদিকে।



বলা



বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
অর্থাৎ কিনা লাগ্‌ছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে—
গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে,
রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।
অর্থাৎ কিনা, এই মনে কর্ রোদ পড়েছে ঘাসেতে,
এই মনে কর্, চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে—
আবার দেখ! এরই মধ্যে হাই তোলবার মানে কি?
আকাশ পানে তাকাস্ খালি, যাচ্ছে কথা কানে কি?
কি বল্লি তুই? এ সব শুধু আবোল তাবোল বকুনি?
বুঝতে হলে মগজ লাগে, ব'লেছিলাম তখুনি।
মগজভরা গোবর তোদের হচ্ছে ঘুঁটে শুকিয়ে,
যায় কি দেওয়া কোন কথা তার ভিতরে ঢুকিয়ে?—
ও শ্যামাদাস! উঠলি কেন? কেবল যে চাস্ পালাতে!
না শুনবি তো মিথ্যে সবাই আসিস্ কেন জ্বালাতে?
তত্ত্বকথা যায় না কানে যতই মরি চেঁচিয়ে—
ইচ্ছে করে ডানপিটেদের কান ম'লে দি পেঁচিয়ে।

হুঁকো মুখো হ্যাংলা

হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ী তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ ?
নাই তার মানে কি ? কেউ তাহা জানে কি ?
কেউ কভু তার কাছে থেকেছ ?
শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার,
আর তার কেউ নাই এ-ছাড়া—
তাই বুঝি একা সে মুখখানা ফ্যাকাশে,
ব'সে আছে কাঁদ-কাঁদ বেচারা ?
থপ্ থপ্ পায়ে সে নাচ্‌ত যে আয়েসে,
গাল ভরা ছিল তার ফুর্তি,
গাইতো সে সারাদিন 'সারে গামা টিম্‌টিম্'
আহ্লাদে গদ গদ মূর্তি।
এই তো সে দুপ'রে বসে ওই উপরে,
খাচ্ছিল কাঁচকলা চট্‌কে—





এর মাঝে হল কি ?   মামা তার মোলো কি ?
    অথবা কি ঠ্যাং গেল মট্‌কে ?
হুঁকোমুখো হেঁকে কয়,   "আরে দূর, তা তো নয়,
    দেখছ না কি রকম চিন্তা ?
মাছি মারা ফন্দি এ   যত ভাবি মন দিয়ে—
    ভেবে ভেবে কেটে যায় দিনটা।
বসে যদি ডাইনে,—   লেখে মোর আইনে—
    এই ল্যাজে মাছি মারি ত্রস্ত ;
বামে যদি বসে তাও,   নহি আমি পিছপাও,
    এই ল্যাজে আছে তার অস্ত্র।
যদি দেখি কোনো পাজি   বসে ঠিক মাঝামাঝি,
    কি যে করি ভেবে নাহি পাইরে—
ভেবে দেখি একি দায়   কোন্ ল্যাজে মারি তায়,
    দুটি বই ল্যাজ মোর নাই রে!"

একুশে আইন



শিব ঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে !
কেউ যদি যায় পিছ্‌লে প'ড়ে
প্যায়দা এসে পাক্‌ড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার ॥

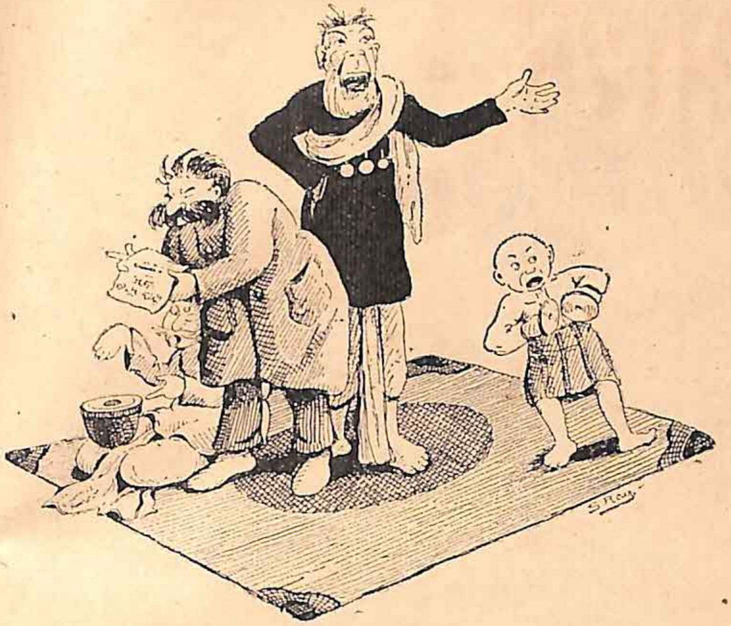
সেথায় সন্ধ্যে ছ'টার আগে,
হাঁচ্‌তে হ'লে টিকিট লাগে ;
হাঁচ্‌লে পরে বিন্‌ টিকিটে—
দম্‌দমাদম্‌ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে ॥

কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চারটি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাক্‌স চায়,—
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশ বার ॥

চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়,
এদিই ওদিক ডাইনে বাঁয়,
রাজার কাছে খবর ছোটে,
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,
দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়
একুশ হাতা জল গেলায় ॥

যে সব লোকে পদ্য লেখে
তাদের ধ'রে খাঁচায় রেখে,
কানের কাছে নানান্‌ সুরে,
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদীর খাতা
হিসেব কষায় একুশ পাতা ॥

হঠাৎ সেথায় রাত দুপুরে,
নাক ডাকালে ঘুমের ঘোরে,
অম্‌নি তেড়ে মাথায় ঘষে,
গোবর গুলে বেলের কষে,
একুশটি পাক ঘুরিয়ে তাকে
একুশ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখে ॥



দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্!

ছুটছে মোটর ঘটর ঘটর ছুটছে গাড়ী জুড়ি ;
ছুটছে লোকে নানান্ ঝোঁকে করছে হুড়োহুড়ি;
ছুটছে কত ক্ষ্যাপার মতো পড়ছে কত চাপা,
সাহেব মেমে থম্‌কে থেকে বলছে 'মামা পাপা!'
আমরা তবু তবলা ঠুকে গাচ্ছি কেমন তেড়ে
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্ ! দেড়ে দেড়ে দেড়ে !"

বর্ষাকালে বৃষ্টিবাদল রাস্তা জুড়ে কাদা,
ঠাণ্ডা রাতে সর্দিবাতে মরবি কেন দাদা ?
হোক্ না সকাল হোক্ না বিকাল
হোক্ না দুপুর বেলা,
থাক্ না তোমার আপিস যাওয়া
থাক্ না কাজের ঠেলা—
এই দেখ না চাঁদ্‌নি রাতের গান এনেছি কেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্ ! দেড়ে দেড়ে দেড়ে !"

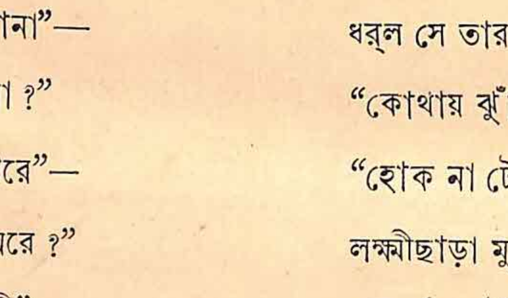
মুখ্যু যারা হচ্ছে সারা পড়ছে ব'সে একা,
কেউ বা দেখ কাঁচুর মাচুর
কেউ বা ভ্যাবাচ্যাকা ;
কেউ বা ভেবে হদ্দ হল, মুখটি যেন কালি ;
কেউ বা ব'সে বোকার মতো মুণ্ডু নাড়ে খালি।
তার চেয়ে ভাই, ভাবনা ভুলে গাওনা গলা ছেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্ ! দেড়ে দেড়ে দেড়ে !"

বেজার হয়ে যে যার মতো করছি সময় নষ্ট,
হাঁটছ কত খাটছ কত পাচ্ছ কত কষ্ট !
আসল কথা বুঝছ না যে, করছ না যে চিন্তা,
শুনছ না যে গানের মাঝে তবলা বাজে ধিন্‌তা ?
পাল্লা ধরে গায়ের জোরে গিটকিরি দাও ঝেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্ ! দেড়ে দেড়ে দেড়ে !"

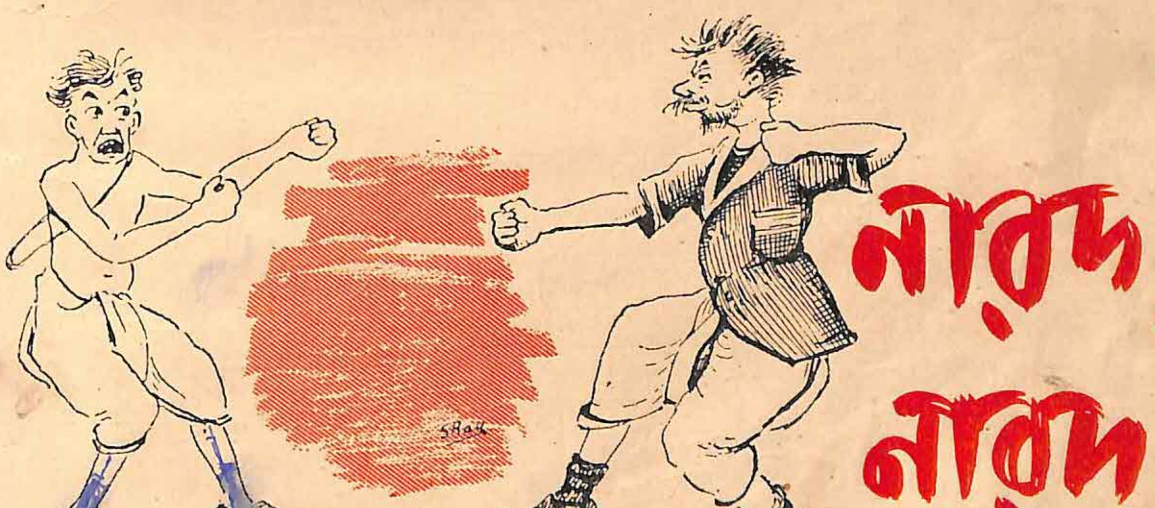
গল্প বলা

"এক যে রাজা"—"থাম্ না দাদা,
রাজা নয় সে, রাজ পেয়াদা।"
"তার যে মাতুল"—"মাতুল কি সে ?
সবাই জানে সে তার পিশে।"
"তার ছিল এক ছাগল ছানা"—
"ছাগলের কি গজায় ডানা ?"
"একদিন তার ছাতের 'পরে"—
"ছাত কোথা হে টিনের ঘরে ?"
"বাগানের এক উড়ে মালী"—
"মালী নয়তো ! মেহের আলি,"
"মনের সাধে গাইছে বেহাগ" —
"বেহাগ তো নয় ! বসন্ত রাগ।"

"থও না বাপু খ্যাঁচা খেঁচি"—
"আচ্ছা বল, চুপ করেছি।"
"এমন সময় বিছনা ছেড়ে,
হঠাৎ মামা আস্‌ল তেড়ে,
ধর্‌ল সে তার ঝুঁটির গোড়া—"
"কোথায় ঝুঁটি ? টাক যে ভরা।"
"হোক না টেকো তোর তাতে কি ?
লক্ষ্মীছাড়া মুখ্যু ঢেঁকি !
ধর্‌ব ঠেসে টুঁটির 'পরে,
পিট্‌ব তোমার মুণ্ডু ধ'রে—
কথার উপর কেবল কথা,
এখন বাপু পালাও কোথা ?"



"হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল শাদাকে বল্‌ছিলি লাল ?
(আর) সেদিন নাকি রাত্রি জুড়ে নাক ডেকেছিস্ বিশ্রী স্বরে ?
(আর) তোদের পোষা বেড়ালগুলো শুনছি নাকি বেজায় হুলো ?
(আর) এই যে শুনি তোদের বাড়ি কেউ নাকি রাখে না দাড়ি ?"
"ক্যান্ রে ব্যাটা ইস্‌টুপিড ? ঠেঙিয়ে তোরে কর্‌ব ঢিট্ !"
"চোপ্‌রাও তুম্ স্পিক্‌টি নট্, মার্‌ব রেগে পটাপট্—
ফের যদি ট্যারাবি চোখ, কিম্বা আবার কর্‌বি রোখ,
কিম্বা যদি অম্‌নি করে মিথ্যেমিথ্যি চ্যাঁচাস জোরে—
আই ডোণ্ট কেয়ার্ কানাকড়ি—জানিস্ আমি স্যাণ্ডো করি ?
ফের লাফাচ্ছিস্ ? অল্‌রাইট্ কামেন্ ফাইট্ ! কামেন্ ফাইট্ !"
"ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি, টেরটা পাবে আজ এখনি !
আজকে যদি থাক্‌ত মামা পিটিয়ে তোমায় কর্‌ত ঝামা।—
আরে ! আরে ! মার্‌বি নাকি ? দাঁড়া একটা পুলিশ ডাকি !
হাঁহাঁহাঁহাঁ ! রাগ ক'রো না, কর্‌তে চাও কি তাই বল না !"
"হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো সত্যি বটেই আমি তো চটিনি মোটেই !
মিথ্যে কেন লড়তে যাবি ? ভেরি-ভেরি সরি, মশলা খাবি ?
'শেক্‌হ্যাণ্ড' আর 'দাদা' বল সব শোধ বোধ ঘরে চল।
ডোণ্ট পরোয়া অল্ রাইট্ হাউ ডুয়ুডু গুড্ নাইট।"



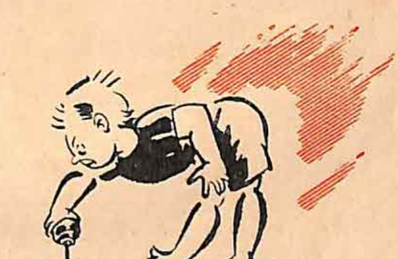


কি মুস্কিল!

সব লিখেছে এই কেতাবে দুনিয়ার সব খবর যত,
সরকারী সব আফিসখানার কোন্ সাহেবের কদর কত।
কেমন ক'রে চাট্নি বানায়, কেমন ক'রে পোলাও করে,
হরেক্ রকম মুষ্টিযোগের বিধান লিখছে ফলাও ক'রে।
সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দাকেতা,
পূজা পার্বণ তিথির হিসাব শ্রাদ্ধবিধি লিখছে হেথা।
সব লিখেছে, কেবল দেখ পাচ্ছিনেকো লেখা কোথায়—
পাগলা ষাঁড়ে কর্‌লে তাড়া কেমন ক'রে ঠেকাব তায়!



ডানপিটে



বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে !—
কোন দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে।
একটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে,
ঠাঁই ঠাঁই শিশি ভাঙে শ্লেট দিয়ে ঠুকে !
অন্যটা হামা দিয়ে আলমারি চড়ে,
খাট থেকে রাগ ক'রে দুম্‌দাম্ পড়ে !
বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে !—
শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে !
একটার দাঁত নেই, জিভ দিয়ে ঘ'ষে,
এক মনে মোমবাতি দেশলাই চোষে !



আরজন ঘরময় নীল কালি গুলে,
কপ্‌ কপ্‌ মাছি ধ'রে মুখে দেয় তুলে !
বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে !—
খুন হ'ত টম্ চাচা ওই রুটি খেলে !
সন্দেহে শুঁকে বুড়ো মুখে নাহি তোলে,
রেগে তাই দুই ভাই ফোঁস ফোঁস ফোলে।
নেড়াচুল খাড়া হয়ে রাঙা হয় রাগে,
বাপ বাপ ব'লে চাচা লাফ দিয়ে ভাগে।

ভূতুড়ে খেলা

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে,
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছনাতে।
কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত পা নেড়ে উল্লাসে,
আহ্লাদেতে ধুপধুপিয়ে কচ্ছে কেমন হল্লা সে।
শুনতে পেলাম ভূতের মায়ের মুচকি হাসি কট্‌কটে—
দেখছে নেড়ে ঝুনুটি ধ'রে বাচ্চা কেমন চট্‌পটে।
উঠছে তাদের হাসির হানা কাষ্ঠ স্বরে ডাক ছেড়ে,
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশানি শব্দে যেন করাত দিয়ে কাঠ চেরে!
যেমন খুশি মারছে ঘুঁষি, দিচ্ছে কষে কানমলা,
আদর ক'রে আছাড় মেরে শূন্যে ঝোলে চ্যাং দোলা।
বলছে আবার, "আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে,
দেখনা ফিরে প্যাখনা ধরে হুতোম-হাসি মুখ ক'রে!





ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁতকা রে,
অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁতকা রে!
ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টিরে,
ওরে আমার হামান-ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টিরে।
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোছনা হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোবরাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্‌রে,
ছিঁচকাঁদুনে ফোক্‌লা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিস্‌রে—"
এই না ব'লে যেই মেরেছে কাদার চাপটি ফট্‌ ক'রে,
কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি—মিলিয়ে গেল চট্‌ ক'রে!



আহ্লাদী

হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদী,
তিন জনেতে জট্‌লা ক'রে ফোক্‌লা হাসির পাল্লা দি।
হাসতে হাসতে আসছে দাদা আসছি আমি আসছে ভাই,
হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই!



ভাবছি মনে, হাসছি কেন? থাকব হাসি ত্যাগ ক'রে,
ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক ক'রে।
পাচ্ছে হাসি চাইতে গিয়ে, পাচ্ছে হাসি চোখ বুজে,
পাচ্ছে হাসি চিম্‌টি কেটে নাকের ভিতর নোখ গুজে।



হাসছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড়
নৌকা ফানুস পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ী তেলের ভাঁড়।
পড়তে গিয়ে ফেলছি হেসে 'ক খ গ' আর শ্লেট দেখে—
উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।

শোন শোন গল্প শোন, এক যে ছিল গুরু,
এই আমার গল্প হল শুরু।
যদু আর বংশীধর যমজ ভাই তারা,
এই আমার গল্প হল সারা।

রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা   হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাসব না-না, না-না!"

সদাই মরে ত্রাসে—   ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।

ঘুম নাহি তার চোখে   আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে!"

যায় না বনের কাছে,   কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!

সোয়াস্তি নেই মনে—   মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।

ঝোপের ধারে ধারে   রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।

হাসতে হাসতে যারা   হচ্ছে কেবল সারা,
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?

রামগরুড়ের বাসা   ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়,
নিষেধ সেথায় হাসা।



হাত গণনা



ও পাড়ার নন্দগোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়ো,
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো।
ছিলনা তার অসুখবিসুখ, ছিল সে যে মনের সুখে,
দেখা যেত সদাই তারে হুঁকোহাতে হাস্যমুখে।
হঠাৎ কি তার খেয়াল হল, চল্‌ল সে তার হাত দেখাতে
ফিরে এল শুকনো সরু, ঠকাটক্ কাঁপছে দাঁতে!
শুধালে সে কয়না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে,
মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চক্ষু বেয়ে।
শুনে লোকে দৌড়ে এল, ছুটে এলেন বদ্যিমশাই,
সবাই বলে, 'কাঁদছ কেন? কি হয়েছে নন্দগোঁসাই?'
খুড়ো বলে, 'বলব কি আর, হাতে আমার পষ্ট লেখা
আমার ঘাড়ে আছেন শনি,
কাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা।
এতদিন যায়নি জানা ফিরছি কত গ্রহের ফেরে—
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে
তখন আমায় রাখবে কে রে?
ষাটটা বছর পার হয়েছি
বাপদাদাদের পুণ্যফলে—
ওরে তোদের নন্দ খুড়ো
এবার বুঝি পটোল তোলে।
কবে যে কি ঘটবে বিপদ কিছু হায় যায় না বলা'—
এই ব'লে সে উঠল কেঁদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা।
দেখে এলাম আজ সকালে
গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো,
বুড়ো আছে নেই কো হাসি,
হাতে তার নেই কো হুঁকো।

গন্ধ বিচার

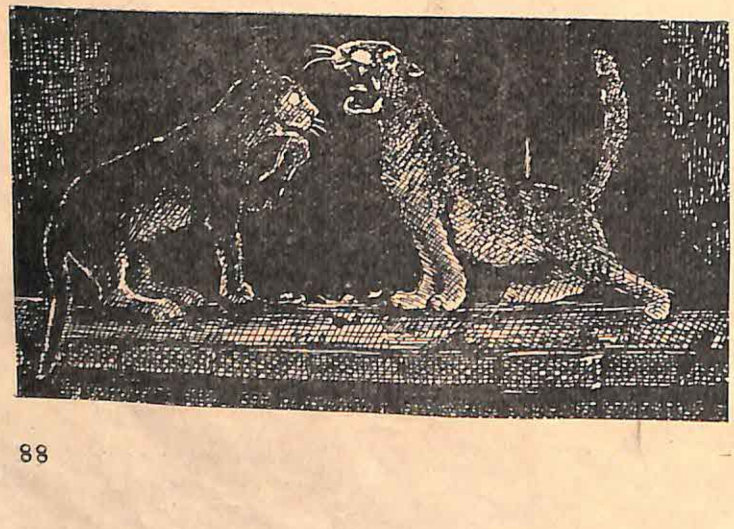
সিংহাসনে বস্‌ল রাজা বাজল কাঁসর ঘণ্টা,
ছট্‌ফটিয়ে উঠল কেঁপে মন্ত্রীবুড়োর মনটা।
বল্‌লে রাজা, মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ ?
মন্ত্রী বলে, এসেন্স দিছি—গন্ধ তো নয় মন্দ !
রাজা বলেন, মন্দ ভালো দেখুক শুঁকে বদ্যি,
বদ্যি বলে, আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।
রাজা হাঁকেন, বোলাও তবে, রাম নারায়ণ পাত্র।
পাত্র বলে, নস্যি নিলাম এক্ষনি এইমাত্র,
নস্যি দিয়ে বন্ধ যে নাক গন্ধ কোথায় ঢুকবে ?
রাজা বলেন, কোটাল তবে এগিয়ে এস, শুঁকবে।
কোটাল বলে, পান খেয়েছি মশলা তাতে কর্পূর,
গন্ধে তারি মুণ্ড আমার একেবারে ভরপুর।
রাজা বলেন, আসুক তবে শের পালোয়ান ভীমসিং,
ভীম বলে, আজ কচ্ছে আমার সমস্ত গা ঝিম্‌ঝিম্।
রাত্রে আমার বোখার হল বলছি হুজুর ঠিক বাৎ,
ব'লেই শুল রাজসভাতে চক্ষু বুজে চিৎপাত।
রাজার শালা চন্দ্রকেতু তারেই ধ'রে শেষটা,
বল্‌ল রাজা, তুমিই না হয় কর না ভাই চেষ্টা।
চন্দ্র বলেন, মারতে চাও তো ডাকাও নাকো জল্লাদ,
গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কি আহ্লাদ ?
ছিল হাজির বৃদ্ধ নাজির বয়সটি তার নব্বই,
ভাবল মনে ভয় কেন আর একদিন তো মরবই,

সাহস ক'রে বল্‌ল বুড়ো, মিথ্যে সবাই বকছিস,
শুঁকতে পারি হুকুম পেলে এবং পেলে বক্‌শিস্।
রাজা বলেন, হাজার টাকা ইনাম পাবে সদ্য,
তাই না শুনে উৎসাহেতে উঠল বুড়ো মদ্দ।
জামার পরে নাক ঠেকিয়ে—শুঁকল কত গন্ধ,
রইল অটল দেখল লোকে বিস্ময়ে বাক্ বন্ধ।
রাজ্যে হল জয় জয়কার বাজল কাঁসর ঢক্কা,
বাপরে কি তেজ বুড়োর হাড়ে পায় না সে যে অক্কা ?



হুলোর গান

বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখ্‌মলে ঢাকা,
জট্‌বাঁধা ঝুল কালো বটগাছতলে,
ধক্‌ধক্ জোনাকির চক্‌মকি জ্বলে,
চুপচাপ চারিদিকে ঝোপ ঝাড়্‌গুলো,
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চীৎকার ক'রে,
কোন্ গানে মন ভেজে শোন্ বলি তোরে,
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ্ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট্ ক'রে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মালপোয়া আধখানা কালথেকে আছে!
হুড়্ হুড়্ ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা,
ধুক্ ক'রে নিভে গেল বুকভরা আশা।
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি,
বিল্‌কুল্ সব দেখি ভেল্‌কির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নীর মুখ যেন চিম্‌নির কালি।
মন-ভাঙা দুখ্ মোর কণ্ঠেতে পুরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।



কাঁদুনে

ছিঁচ্ কাঁদুনে মিচ্‌কে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে,
ঘ্যাঙায় শুধু ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ ঘ্যান্‌ঘ্যানে আর প্যান্‌প্যানে—
কুঁকিয়ে কাঁদে খিদের সময়, ফুঁপিয়ে কাঁদে ধম্‌কালে,
কিম্বা হঠাৎ লাগলে ব্যথা, কিম্বা ভয়ে চম্‌কালে ;
অল্পে হাসে অল্পে কাঁদে, কান্না থামায় অল্পেতেই,
মায়ের আদর দুধের বোতল কিম্বা দিদির গল্পেতেই—
তারেই বলি মিথ্যে কাঁদন ; আসল কান্না শুনবে কে ?
অবাক্ হবে থম্‌কে রবে সেই কাঁদনের গুণ দেখে !
নন্দঘোষের পাশের বাড়ী বুথ্ সাহেবের বাচ্চাটার
কান্নাখানা শুনলে বলি কান্না বটে সাচ্চা তার।
কাঁদবে না সে যখন তখন, রাখবে কেবল রাগ পুষে,
কাঁদবে যখন খেয়াল হবে খুন-কাঁদুনে রাক্ষুসে !
নাইকো কারণ নাইকো বিচার মাঝ-রাতে কি ভোরবেলা,
হঠাৎ শুনি অর্থবিহীন আকাশ-ফাটন জোর গলা।
হাঁকড়ে ছোটে কান্না যেমন জোয়ার বেগে নদীর বান,
বাপ মা বসেন হতাশ হয়ে শব্দ শুনে বধির কান।
বাস্‌রে সে কি লোহার গলা ? এক মিনিটও শান্তি নেই ?
কাঁদন ঝরে শ্রাবণ ধারে, ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই !
ঝুমঝুমি দাও পুতুল নাচাও, মিষ্টি খাওয়াও একেশোবার,
বাতাস কর, চাপড়ে ধর, ফুটবে নাকো হাস্য তার।
কান্নাভরে উল্‌টে পড়ে কান্না ঝরে নাক দিয়ে,
গিল্‌তে চাহে দালানবাড়ী হাঁ'খানি তার হাঁক্ দিয়ে,
ভূত-ভাগানো শব্দে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে—
কান্না শুনে ধন্যি বলি বুথ্ সাহেবের বাচ্চারে।

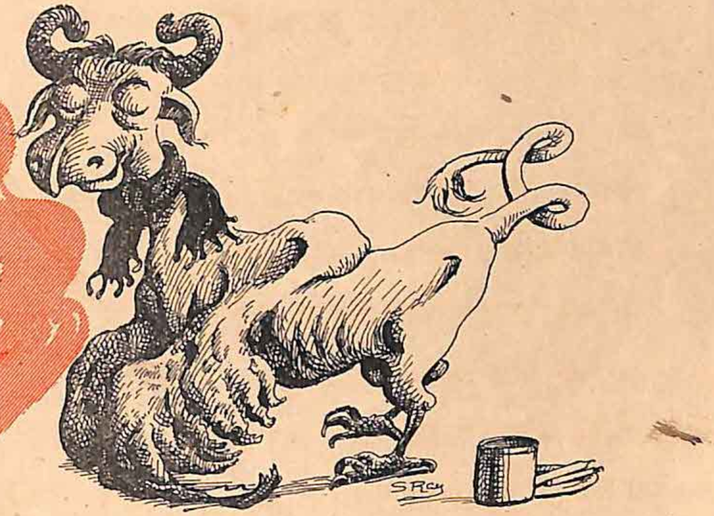


ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না—
সত্যি বলছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পারব না।
মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না—
জানোনা মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?
এস এস গর্তে এস, বাস ক'রে যাও চারটি দিন,
আদর ক'রে শিকেয় তুলে রাখব তোমায় রাত্রিদিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাকবে না?
মুগুর আমার হাল্‌কা এমন মারলে তোমায় লাগবে না।
অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!
আমি আছি, গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

ভয় পেয়ো না



ট্যাঁশ গরু



ট্যাঁশ্ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে ;
যার খুশি দেখে এস হারুদের আফিসে।
চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত,
ফিট্‌ফাট্ কালোচুলে টেরিকাটা চোস্ত।
তিন-বাঁকা শিং তার, ল্যাজখানি প্যাঁচান—
একটুকু ছোঁও যদি, বাপ্‌রে কি চ্যাচান!
লট্‌খটে হাড়গোড় খট্‌খট্ ন'ড়ে যায়,
ধম্‌কালে ল্যাগ্‌ব্যাগ্ চমকিয়ে প'ড়ে যায়।
বর্ণিতে রূপ গুণ সাধ্য কি কবিতার,
চেহারার কি বাহার—ঐ দেখ ছবি তার।
ট্যাঁশ্ গরু খাবি খায় ঠ্যাস দিয়ে দেয়ালে,
মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে না জানি কি খেয়ালে;
মাঝে মাঝে তেড়ে ওঠে, মাঝে মাঝে রেগে যায়,
মাঝে মাঝে কুপোকাৎ দাঁতে দাঁত লেগে যায়।
খায় না সে দানাপানি—ঘাস পাতা বিচালি,
খায় না সে ছোলা ছাতু ময়দা কি পিঠালি ;
রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়সে,
সাবানের সূপ আর মোমবাতি খায় সে।
আর কিছু খেলে তার কাশি ওঠে খক্‌খক্,
সারা গায়ে ঘিন্‌ঘিন্ ঠ্যাং কাঁপে ঠক্‌ঠক্।
একদিন খেয়েছিল ন্যাক্‌ড়ার ফালি সে—
তিন মাস আধমরা শুয়েছিল বালিশে।
কারো যদি সখ্ থাকে ট্যাঁশ্ গরু কিন্‌তে,
সস্তায় দিতে পারি, দেখ ভেবে চিন্তে।

নোটবই



এই দেখ পেনসিল্, নোটবুক এ-হাতে,
এই দেখ ভরা সব কিল্‌বিল্ লেখাতে।
ভালো কথা শুনি যেই চট্‌পট্ লিখি তায়—
ফড়িঙের ক'টা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায় ;
আঙুলেতে আঠা দিলে কেন লাগে চট্‌চট্,
কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্।
দেখে শিখে প'ড়ে শুনে ব'সে মাথা ঘামিয়ে
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ।
কান করে কট্ কট্ ফোড়া করে টন্ টন্—
ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন।
কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খটকা,
ঝোলাগুড় কিসে দেয় ? সাবান না পটকা ?
এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে,
জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।
পেট কেন কামড়ায় বল দেখি পার কে ?
বল দেখি ঝাঁজ কেন জোয়ানের আরকে ?
তেজপাতে তেজ কেন ? ঝাল কেন লঙ্কায় ?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায় ?
কার নাম দুন্দুভি ? কাকে বলে অরণি ?
বল্‌বে কি, তোমরা তো নোটবই পড়নি !



আরে আরে জগমোহন—এস, এস, এস,—
বল্‌তে পার কোথায় থাকে আত্মানাথের মেশো ?
আত্মানাথের নাম শোননি ? খগেনকে তো চেন ?
শ্যাম বাগ্‌চি খগেনেরই মামাশ্বশুর জেনো।
শ্যামের জামাই কেষ্টমোহন, তার যে বাড়ীওলা—
(কি যেন নাম ভুলে গেছি), তারই মামার শালা ;
তারই পিশের খুড়তুতো ভাই আত্মানাথের মেশো,
লক্ষ্মী দাদা ঠিকানা তার একটু জেনে এসো।
ঠিকানা চাও ? বল্‌ছি শোন ; আমড়াতলার মোড়ে,
তিন-মুখো তিন রাস্তা গেছে, তারি একটা ধ'রে
চল্‌বে সিধে নাকবরাবর, ডানদিকে চোখ রেখে,
চল্‌তে চল্‌তে দেখবে শেষে রাস্তা গেছে বেঁকে ;
দেখবে সেথায় ডাইনে বাঁয়ে পথ গিয়েছে কত,
তারি ভিতর ঘুরবে খানিক গোলকধাঁধার মতো।
তার পরেতে হঠাৎ বেঁকে ডাইনে মোচড় মেরে,
ফিরবে আবার বাঁয়ের দিকে তিনটে গলি ছেড়ে।
তবেই আবার পড়বে এসে আমড়াতলার মোড়ে,
তার পরে যাও যেথায় খুশি, জ্বালিয়োনাকো মোরে।

আকাশের গায়ে কিবা রামধনু খেলে,
দেখে চেয়ে কত লোক সব কাজ ফেলে ,
তাই দেখে খুঁতধরা বুড়ো কয় চটে,
দেখছ কি, এই রঙ পাকা নয় মোটে ॥

ঢপ্‌ ঢপ্‌ ঢাক ঢোল ভপ্‌ ভপ্‌ বাঁশি,
ঝন্‌ ঝন্‌ করতাল্‌ ঠন্‌ ঠন্‌ কাঁসি।
ধুমধাম বাপ্‌ বাপ্‌ ভয়ে ভ্যাবা চ্যাকা,
বাবুদের ছেলেটার দাঁত গেছে দেখা ॥

বিজ্ঞান শিক্ষা



আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটস্কোপ' দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।
কোন দিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন দিকে থেকে যায় চাপা ;
কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু, কতখানি ঠক্‌ঠকে ফাঁপা।
মন তোর কোন দেশে থাকে, কেন তুই ভুলে যাস্ কথা—
আয় দেখি কোন ফাঁক দিয়ে, মগজেতে ফুটো তোর কোথা।
টোল-খাওয়া ছাতাপড়া মাথা, ফাটা-মতো মনে হয় যেন,
আয় দেখি বিশ্লেষ ক'রে—চোপ্‌রও ভয় পাস্ কেন ?
কাৎ হয়ে কান ধ'রে দাঁড়া জিভখানা উল্‌টিয়ে দেখা,
ভালো ক'রে বুঝে শুনে দেখি—বিজ্ঞানে যে-রকম লেখা।
মুণ্ডুতে 'ম্যাগনেট' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্‌ট' ক'রে,
ইঁট দিয়ে 'ভেলসিটি' ক'ষে দেখি মাথা ঘোরে কিনা ঘোরে।

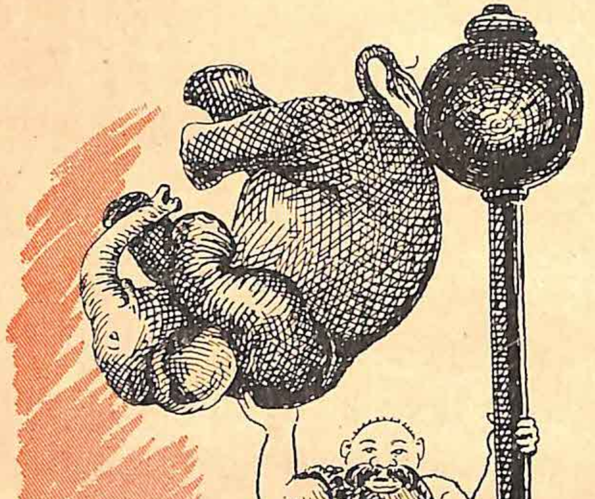


ফস্কে গেল!

দেখ্ বাবাজি দেখ্‌বি নাকি   দেখ্‌রে খেলা দেখ্ চালাকি,
ভোজের বাজি ভেল্কি ফাঁকি   পড়্ পড়্ পড়্‌বি পাখী—ধপ্
লাফ দি'রে তাই তালটি ঠুকে   তাক্ ক'রে যাই তীর ধনুকে,
ছাড়্‌ব সটান্ ঊর্ধ্বমুখে   হুশ্ ক'রে তোর লাগ্‌বে বুকে—খপ্
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়িয়ে হামা   খাপ্ পেতেছেন গোষ্ঠ মামা,
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা,   এইবারে বাণ চড়িয়ে নামা—চট্!
ঐ যা! গেল ফস্কে ফেঁসে—হেঁই মামা তুই ক্ষেপ্‌লি শেষে?
ঘ্যাচ ক'রে তোর পাঁজর ঘেঁষে   লাগ্‌ল কি বাণ ছট্‌কে এসে—ফট্?

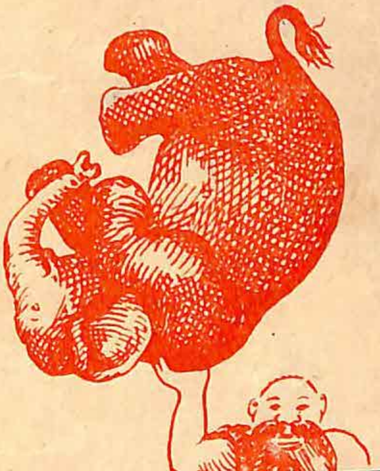


পালোয়ান



খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতী লোফেন যখন তখন,
দেহের ওজন ঊনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন।
একদিন এক গুণ্ডা তাকে বাঁশ বাগিয়ে মার্‌ল বেগে—
ভাঙ্‌ল সে-বাঁশ শোলার মতো মট্‌ ক'রে তার কনুই লেগে।

এই তো সেদিন রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে দৈব বশে,
উপর থেকে প্রকাণ্ড ইঁট পড়ল তাহার মাথায় খ'সে।
মুণ্ডুতে তার যেম্‌নি ঠেকা অম্‌নি সে ইঁট এক নিমেষে,
গুঁড়িয়ে হ'ল ধুলোর মতো, ষষ্ঠি চলেন মুচ্‌কি হেসে।
যষ্ঠি যখন ধমক হাঁকে কাঁপতে থাকে দালান বাড়ী,
ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে উল্টে পড়ে গরুর গাড়ী!
ধুম্‌সো কাটের তক্তা ছেঁড়ে মোচড় মেরে মুহূর্তেকে,
একশো জালা জল ঢালে রোজ স্নানের সময় পুকুর থেকে।
সকাল বেলার জলপানি তার তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া,
সঙ্গে তার চৌদ্দ হাঁড়ি দৈ কি মালাই মুড়কি দেওয়া।
দুপুর হ'লে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেক্‌চি ভ'রে,
বরফ দেওয়া উনিশ কুঁজো সরবতে তার তৃষ্ণা হরে।
বিকাল বেলা খায় না কিছু গণ্ডা দশেক মণ্ডা ছাড়া
সন্ধ্যা হ'লে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া।
রাত্রে সে তার হাত পা টেপায় দশটি চেলা মজুত থাকে,
দুম্‌দুমাদুম্‌ সবাই মিলে মুগুর দিয়ে পেটায় তাকে।
বল্‌লে বেশি ভাববে শেষে এসব কথা ফেনিয়ে বলা—
দেখবে যদি আপন চোখে যাওনা কেন বেনিয়াটোলা।



মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম্ –
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম ॥

বল্‌ব কি ভাই হুগ্‌লি গেলুম,
বল্‌ছি তোমায় চুপি-চুপি—
দেখতে পেলাম তিনটে শুয়োর
মাথায় তাদের নেইকো টুপি ॥



আবোল তাবোল



মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আব্ছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পূরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশার ঝরনা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক্
নাইবা বুঝুক বেবাক্ লোক
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।

ছুট্‌লে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ তবলা বাজে—
রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত!
হ্যাংলা হাতী চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।



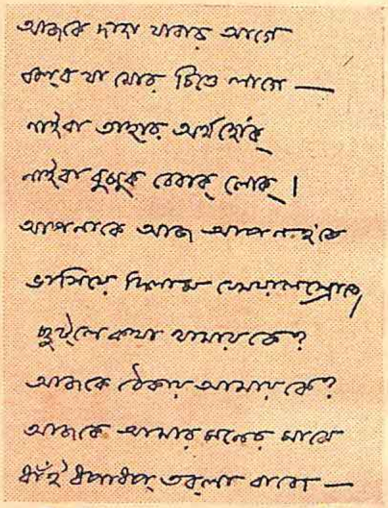
সুকুমার রায়

আজ থেকে ৫৬ বছর আগে বাংলাদেশে সুকুমার রায়ের জন্ম আমাদের এক বিস্ময়কর সৌভাগ্য। বিস্ময়কর এই জন্যে যে এমন অনাবিল হাসি বাংলাসাহিত্যে বিরল। আমাদের চারদিকের জগৎটা নেহাতই বাঁকাচোরা; আমরা অনেকেই মানুষ হিসেবে এবং আমাদের অনেকেরই কার্যকলাপ কেমন যেন অদ্ভুত, উল্টো পাল্টা, ভেবে দেখতে গেলে নেহাতই হাস্যকর। কিন্তু কেউ সেটা দেখিয়ে দিলেই আমরা 'মনে মনে ভারি চটি'। বুঝতে হবে সেখানেই আমাদের রসবোধের অভাব। সত্যিকারের রসবোধ তাঁরই—যিনি নিজের আর পরের সবার কাণ্ড দেখেই সমানভাবে হাসতে পারেন, হাসাতে পারেন। সেই দেবদুর্লভ রসবোধ বাঙালির কোনোদিনই খুব বেশি ছিলো না। অন্তত আমাদের সাহিত্যে তার পরিচয় কমই পাওয়া যায়। কাজেই বাংলাদেশে সুকুমার রায়ের আবির্ভাব বিস্ময়কর ছাড়া আর কী! আজ যদি সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল', 'হযবরল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী' এবং 'ঝালাপালা' নিয়ে কোনো গম্ভীর আত্মাভিমানী মাননীয় ব্যক্তিও পড়তে বসেন তাহলে তাঁকেও হাসতে হাসতে স্বীকার করতে হবে যে সুকুমার রায়ের লেখার অদ্ভুত জীবদের জগতে তিনি নিজেও অনুপস্থিত নন। এ হাসি যিনি হাসতে পারেন তাঁর প্রতিভা লোকোত্তর, সেই অতুলনীয় প্রতিভা ছিলো সুকুমার রায়ের।



ইংরিজি ১৮৮৭ সালে, বাংলা ১২৯৪ সনের ১৩ই কার্তিক বাংলাদেশের এক আশ্চর্য প্রতিভাশালী পরিবারে সুকুমার রায়ের জন্ম হয়। সুকুমার রায়ের পিতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় ছোটোদের জন্যে পুরাণের গল্প যেমন মিষ্টি ক'রে বলেছেন তেমনি ক'রে আজ পর্যন্ত আর কেউ বোধহয় বলেননি। তাছাড়া হাফটোন ব্লক তৈরি করবার প্রথা তিনিই প্রথম এদেশে প্রবর্তন করেন। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর আদি নিবাস ছিলো মৈমনসিংহের মশুয়া গ্রামে। তাঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই, পাঁচ ভাই-ই কৃতী। জ্যেষ্ঠ সারদারঞ্জন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ও ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। মুক্তিদারঞ্জনও বিদ্যাসাগর কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক। উপেন্দ্রকিশোর ও কুলদারঞ্জন উভয়েই শিশুসাহিত্যে

স্বনামধন্য। কনিষ্ঠ প্রমদারঞ্জনও একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর সন্দেশে প্রকাশিত 'বনের খবর' একদিন পাঠকসমাজে খুব সমাদর লাভ করেছিল। প্রমদারঞ্জনের কন্যা লীলা মজুমদার শিশু-সাহিত্যে এক নতুন জগৎ নিয়ে এসেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের বোনের বিবাহ হয় সুবিখ্যাত সুগন্ধি প্রস্তুতকারক এইচ্ বোসের সঙ্গে। এঁর ছেলেদের মধ্যে নীতীন্দ্র, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদির নাম বাংলার ছায়াছবি ও খেলার জগতে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে। উপেন্দ্রকিশোরের সন্তানরাও সকলেই প্রতিভাশালী। সুকুমার রায় তো অতুলনীয় প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ দুই সহোদর সুবিনয় রায়, সুবিমল রায়ের লেখার সঙ্গে বাংলার শিশু-মাত্রেরই পরিচয় আছে। আর এঁদের বোন সুখলতা রাওয়ের নাম কে না জানে! অপর বোন পুণ্যলতাও সুলেখিকা, সন্দেশের পাঠক মাত্রেরই তাঁর রচনা অত্যন্ত ভালো লাগতো। যতোদূর জানা যায় সুকুমার রায় প্রথম কবিতা লেখেন ৯ বছর বয়সে। এ কবিতাটি প্রথম হলেও এতেই সুকুমার রায়ের প্রতিভার ইঙ্গিত ছিলো। ছাপার অক্ষরে এটি বেরোয় শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত তখনকার ছেলেদের মাসিক 'মুকুল' কাগজে। লেখাপড়াতেও সুকুমারবাবু মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রি দুই বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি. এস্-সি পাশ করবার পর কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লাভ ক'রে ১৯১১ সালে তিনি বিলেত যান। বিলেতের ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অব্ টেকনোলজিতে ফোটোগ্রাফি ও ব্লক তৈরির প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ ক'রে ইনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন ১৯১৩ সালে। ম্যাঞ্চেস্টার স্কুলে সুকুমারবাবু তাঁর নিজস্ব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে একটি ব্রোঞ্জের পদক পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিলেতে থাকতে যে-সব বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো তাঁদের মধ্যে হাভেল ও রোথেনস্টাইনের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্লক তৈরি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিলো অসামান্য। এ-সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা ক'রে তিনি বিলেত থেকে এফ্. আর. পি. এস্ উপাধি লাভ করেন—এ-সম্মান বাঙালির মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র তাঁরই। অঙ্ক-বিজ্ঞান এবং তৎসংশ্লিষ্ট কারুশিল্পে ছিলো তাঁর অসাধারণ মেধা। এ-বিষয়ে বিখ্যাত ইংরেজ ননসেন্স লেখক লুইস্ ক্যারলের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল দেখা যায়। দু'জনেই বিজ্ঞানে পণ্ডিত আবার ননসেন্স লেখায় দু'জনেই সিদ্ধহস্ত। এটা একটা অপূর্ব ব্যাপার যে বিজ্ঞানের যথাযথতায় যাঁরা আনন্দ পান তাঁরাই আবার সেই জগতের সন্ধান দেন যেখানে সব কিছুই বেহিসাবে চলে, যেখানে কিছুই নিয়মের গণ্ডিতে ধ'রে রাখা যায় না—যেখানে 'আজগুবি চাল, বেঠিক বেতাল' 'অসম্ভবের ছন্দে' বেপরোয়া ছুটে চলে। 'এ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' কিংবা 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস' পড়ে কে বলবে এই বইয়ের লেখক গুরুগম্ভীর মাষ্টারমশাই রেভারেণ্ড ডড্—মোটা মোটা ছাত্রপাঠ্য অঙ্কের বইয়ের প্রণেতা! সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' কিংবা 'হ-য-ব-র-ল' পড়েও কল্পনা করা শক্ত হয় যে ইনি অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, বিজ্ঞানের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন।



'ননসেন্স'-এর দিকে ঝোঁক সুকুমার রায়ের ছেলেবেলা থেকেই ছিলো। মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের সময়ই তিনি ননসেন্স ক্লাব নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্লাব থেকে 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' নামে একখানা হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো।

সুকুমারবাবুর ছবি আঁকার দক্ষতাও ছিলো অতুলনীয়। তাঁর কবিতার মতো তাঁর ছবিগুলিও তিনি যেন এক অদ্ভুত অপূর্ব জগতের থেকে নিয়ে এসেছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় ছবি আঁকতে তিনি কোথাও শেখেননি। নিজের প্রতিভা দিয়েই তিনি নিজের মনের মতো ছবি আঁকতেন। এই 'আবোল-তাবোল' বইখানির সমস্ত ছবিই আঁকা সুকুমারবাবুর নিজের। কয়েকখানা নতুন ছবি যোগ করা হয়েছে, যেমন: 'প্যাঁচা আর প্যাঁচানী', 'গন্ধ বিচার', 'ডানপিটের'র ছোট্ট গুণ্ডাছুটো 'সৎপাত্র'—এ-ছবিগুলো আঁকা কিন্তু সুকুমারবাবুর ছেলে সত্যজিতের। সত্যজিৎ সুকুমারবাবুর যোগ্যপুত্র—এ-ছবিগুলো একবার দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সুকুমারবাবুর নাটক লেখবার দিকে ঝোঁক হয়। ছোটোদের জন্যে লেখা তাঁর 'অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', আর বড়দের জন্য তাঁর 'চলচিত্তচঞ্চরী' যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন অনাবিল হাস্যরসের নাটক রচনায় তিনি কতখানি দক্ষ ছিলেন।

১৩৩০ সালের ২৪শে ভাদ্র মাত্র ৩৬ বছর বয়েসে সুকুমারবাবুর মৃত্যু হয়। তাঁর এই অকালমৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিলো সেই জন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন! বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভায় যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীয় রচনা দেখা যায় না। তাঁর এ বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকাল মৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চির-কালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।"



সুকুমার রায় সম্বন্ধে কোনো কথা বলেই যেন তৃপ্তি হয় না, কোনো সুখ্যাতিই যেন তাঁর যোগ্য ব'লে মনে হয় না। আমাদের নিত্য নির্বিচার ব্যবহারে বিশেষণগুলি তাদের অর্থের তীক্ষ্ণতা হারিয়েফেলেছে। তবু 'অতুলনীয়' কথাটি সুকুমার রায়ের নামের সঙ্গে যুক্ত হলে হয়তো তার হারানো মর্যাদা কিছুটা ফিরে পায়। বাংলায় সুকুমার রায়ের কোনো তুলনা নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম। কেননা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে একমাত্র সুকুমারবাবুর সাহিত্য সম্বন্ধেও আমরা গর্ব ক'রে বলতে পারি যে 'এমন আর কোথাও নেই।'

'নিজেকে হাসাবার জন্যে সুকুমার রায় পরকে কাঁদাতেন না। দুর্দশাগ্রস্ত মানবের কাহিনীকে শৌখিনভাবে সাহিত্যে ও নাটকে এনে চোখের জল ফেলাবার যে চেষ্টা তিনি দেখে এসেছেন সেটা পছন্দ করতেন না। সত্যিকারের দরদদিয়ে তিনি তাদের দুঃখ অনুভব করতেন। হাসির ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুতো তাদের জন্য তাঁর কান্না। যারা সবার নিচে পড়ে রয়েছে তাদের বেদনা তাঁর মনে জেগেছিল। সমবেদনা দিয়ে তিনি সকলকে কাছে টানতেন! এই সমবেদনা শুধু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না, সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো।'

—**ডাঃ কালিদাস নাগ**

সেই 'আজগুবি চাল, বেঠিক বেতাল' 'অসম্ভবের ছন্দ'...

হ-য-ব-র-ল

সাত দুগুণে চোদ্দর চার নামে, হাতে থাকে কি? হাতে থাকে পেনসিল। কেউ পড়ে যেতে যেই বলেছ ষাট-ষাট, অমনি নিলামে ডাক চড়বে, একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি। বিচার করে তিন মাসের জেল আর সাত দিনের ফাঁসির হুকুম হলো, কিন্তু আসামী কই? তখন লোক ধরে আনতে ছুটলো আসামে। পণ্ডিত কাক, বি-এ পোশ ছাগল, উকিল কুমির আর হাকিম হুতোম প্যাঁচা—হাসির হুল্লোড়। বড় টাইপ। অসংখ্য ছবি। দু'রঙে ছাপা দাম ২৲

প্যাগলা দাশু

কাগাবগা করে চুল ছাঁটা, কাক-তাড়ানো চেহারা, কিন্তু বলতে পারো, সে পেণ্টেলুন পরে কেন? পেণ্টেলুন পরে, ভালো করে ইংরিজি শিখবে বলে। তাকে না দিয়ে যদি কেউ মিহিদানা খেতে চায়, দেখবে মিহিদানা চীনে পটকা হয়ে গেছে। তেমনি উপক্রমণিকা হয়ে গেছে ডিটেকটিভ উপন্যাস। আর শুধুই কি দাশু? চালিয়াত শ্যামচাঁদ, সবজান্তা দুলিরাম আর মন্দকপাল নন্দ! বৈজ্ঞানিক ভোলা আর যজ্ঞিদাসের মামা? সবাই এক-একটি রত্ন। দু'রঙে ছাপা। অনেক মজার ছবি। দাম ২॥০

বহুরূপী

সুকুমারবাবুর প্রত্যেকটি বই-ই বাঙলা শিশু-সাহিত্যের এক নম্বরের বই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি তালিকা করা যায়, সে-তালিকা যেখানেই শেষ হোক, এর প্রথম স্থান অবধারিত। আঁর সে-স্থান চিরস্থায়ী। 'বহুরূপী' সুকুমারবাবুর অপ্রকাশিত রচনা—গল্পে, ছন্দে—অপূর্ব, অদ্ভুত। বড় টাইপ, নানান রঙে ছাপা লেখার সঙ্গে মিলেছে এসে ছবি, সোনার সঙ্গে যেমন সোহাগা। দাম এক টাকা বারো আনা, কিন্তু মনে হবে যেন হাতের মুঠোতে চাঁদ নিয়ে চলেছি।

ঝালাপালা

ছেলেমেয়েদের জন্য সত্যিকারের হাসির নাটক আমাদের দেশে নেই। সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা' সেই লজ্জা, সেই অভাব দূর করলো এতদিনে। 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'হিংসুটে'—হাসির বারুদে ঠাসা চার-চারটি নাটক এই বইয়ে—যেমন মজার গান, কথাবার্তা, তেমনি সব মজাদার চরিত্র। এমন হাসির ব্যাপার যে ছোটোরা শুধু পড়েই শান্তি পাবে না, অভিনয় করে আরো অনেকের মধ্যে সে-হাসি সংক্রামিত করে দিতে চাইবে। স্বরলিপি সহ শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ২৲